৫ ফোড়ন

৫টি
ভিন্ন স্বাদের গল্প নিয়ে
এক অনবদ্য সংকলন

সোমা দাস

৫ ফোড়ন

সোমা দাস

উৎসর্গ

জয় রাম

আমি আমার প্রথম বই 'পাঁচ ফোড়ন' আমার বাবা স্বর্গীয় অমলেন্দু রায় এবং শ্বশুর মশাই স্বর্গীয় আনন্দ চন্দ্র দাস, এনাদের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করলাম।

সোমা দাস

লেখিকার পরিচয়

লেখিকা **সোমা দাসের** গল্প লেখার হাতেখড়ি, যখন ক্লাস সিক্স সে সময়ে হঠাৎ একদিন খাতার পেছনে দু চার লাইনের ছড়া লেখা দিয়ে। আসলে পড়ায় কিভাবে ফাঁকি মারা যায় তার একটা প্রস্তুতি বলা যায়। প্রথমে বাবা-মা কে দেখালেও শুরুতে তাঁরা বিশ্বাস করতে চায় না। ভাবে কারুর দেখে লেখা। শেষ অবধি এক বন্ধুর জন্মদিনের কার্ডে শুভেচ্ছা জানিয়ে ছয় লাইনের একটি কবিতা লিখে মায়ের সামনে বসে। সেদিন মায়ের বিশ্বাস হয়। তারপর টুকটাক লেখালেখি। পুরোটাই মর্জির ওপর। কলেজে পড়া কালীন লেখালেখি চলত। বাড়ির আত্মীয় স্বজন ছিল পাঠক। তাঁরাই তারিফ করতো উৎসাহ দিত। কলেজের পর বিয়ে। তারপর বেশ কিছু বছর ওসব বন্ধ দীর্ঘ অসুস্থতার কারণে। তারপর ২০০৮ থেকে আবার লেখা শুরু। তখন নাটক লেখা ছিল নিয়মিত। বাচ্ছাদের দিয়ে আবাসনের স্টেজে বিভিন্ন সময়ে মঞ্চস্থ করতেন সেই সব নাটক। সোমা দাসের লেখা একটি নাটক **"আলোয় ফেরা"** যাদবপুর ইউনিভার্সিটির কমুউনিটি রেডিও সেন্টার থেকে ব্রডকাষ্ট হয়।লেখাটির বিষয় ছিল সার্বজনীন শিক্ষা। সেই লেখাটি ওদের বাৎসরিক সমগ্র ভারত ব্যাপী কমিউনিটি রেডিও সেন্টারের প্রতিযোগিতায় যাবার জন্য মনোনীত হয়। এরপর শুরু হয় ফেসবুক খুলে গল্প লেখার যাত্রা। এখান থেকেও একটা গল্প সিলেক্ট করে দেববানী দত্ত তাদের **"সৌরভ"** লিটিল ম্যাগাজীনে।

সূচিপত্র

শাস্তি

সোমা দাস

সামনে বঙ্গলিপি খাতাটা খোলা, হাতে ইঙ্কপেন নিয়ে বসে আছি।আমায় গল্প লিখতে হবে।প্রথমে লিখলাম....এক দেশে এক রাজা ছিল.... দিলাম কেটে। আবার লিখলাম একটা ভূত ছিল, শেওড়া গাছে ঠ্যাঙ ঝুলিয়ে... নাহ হচ্ছে না.... যতনা লিখলাম তার বেশী কালির আঁচড়ে পাতা ভরিয়ে তুললাম। আসলে এই গল্প লেখাটা আমার শাস্তি। এই শাস্তিটা আমার মায়ের দেওয়া।

কি আর করবে মা? আমাকে নিয়ে তার হাড়মাস ভাজা ভাজা হয়ে যাবার যোগার। শীতের ছুটি পড়েছে। তাই সকাল সকাল ছুটীর কাজের লেখাগুলো করে নেবার পর আমার অফুরান সময়। আর সেইটা হয়েছে মায়ের বিপদ। আমাদের ঘরের সামনে পাঁচিল ঘেরা ছোট্ট বাগানটাতে বাবা লাইন দিয়ে বেল আম নোনা আতা জাম পেয়ারা সব গাছ লাগিয়েছে। মাঝখানটাতে গোলাপ গাছ। যদিও তখন গোলাপ গাছের ঝোড়ো কাকের দশা। কারণ আমার ভাই তাদের ছাত্র স্নেহে ক্লাসের পড়া ধরেছে। তারপর পড়া না

বলতে পাড়ায় তার কিন্ডারগার্টেন স্কুলের আন্টির মত বকে বকে ঐ দশা!

সে যাই হোক, ঐ গাছগুলো আমার খুব প্রিয়। আম আর আতাগাছটার কান্ডগুলো পাশাপাশি খানিকটা উঠে একসময় একে অপরকে জড়িয়ে বন্ধুর মত পরষ্পরের ডালপালা বিস্তার করেছে। তা পাঁচিলের বেশ খানিকটা ওপরে একদম রাস্তার দিকে আম আর আতা গাছের মোটা ডালদুটো এমন ভাবে জড়িয়ে বেড়েছে যে একদম সিঙ্গল বিছানার মত। ঐ জায়গাটি হল আমার সবচেয়ে প্রিয় জায়গা।

পড়া হয়েগেলে একলাফে গেছো বাঁদরের মত ঐ খানটাতে গিয়ে শুয়ে পড়তাম আর আমার ঠ্যাঙ দুটো সামনের ডালে সাপোর্ট দিত। মায়ের চিন্তা ঐখানে আমার শোওয়া নিয়ে।

আমাদের বাড়িতে বাবা ভোর চারটের উঠে গীতাপাঠ করতো। মা তার আধঘন্টা পরে উঠে সংসারের কাজে লেগে পড়তো। পুরো ছোটবেলা জুড়ে এই দৃশ্যই দেখে এসেছি। দুই ভাইবোন আমরা। বাবা কেবল মাত্র পরীক্ষার সময় আমাকে ভোর বেলায় তুলে দিত। নচেৎ সাড়ে পাঁচটার মধ্যে উঠে পড়তে হত। ঘুম চোখে বিছানা ছেড়ে

বারান্দায় এসে প্রকৃতির স্নিগ্ধতায় মুগ্ধ হয়ে যেতাম। তারপরে শুরু হত মায়ের লঙ প্লে রেকর্ড.... কি রে দাঁত মাজলি, পড়তে বসলি, কই পড়ছিস কানে আওয়াজ আসছে না কেন? কিরে যাব আমি.... এই রকম নানাবিধ হুমকি চলতে থাকতো। কোন একসময় পড়া শেষ করে এক ছুটে গাছে। বাবা ততক্ষণে অফিসের পথে।

ভাইটা আমার ভীষণ শান্ত কেবল মায়ের আগেপিছে ঘোরে। ছোট্ট ভাইটি তখন 'ট 'দিয়ে কথা বলতো। গীতা পিসিকে অনুকরণ করে মা কে বলতো... ও বৌদি টোমার বাসন মেজে দিই... শুনে খুব হাসতাম। কত ভুলভাল উচ্চারণ করে কথা বলতো ভাই। তেতলের (পেতল)বাসন, একলা বৈশাখ... আরো কত কি। মায়ের ভাই কে নিয়ে চিন্তা নেই। যত জ্বালা ছিল আমাকে নিয়ে।

পাশের বাড়ির দিদা মহা ইয়ে। খালি খালি আমার নামে মায়ের কাছে নালিশ করতো। একটু পেয়ারা গাছের ডালে উঠে দোল খাচ্ছিলাম। এই ডাল খুব শক্ত হয় সেদিন বাবা বলছিল গাছে জল দিতে দিতে। আমি তখন পেয়ারা গাছেই ছিলাম। বাবাকে বললাম, তাহলে দোল খেতে পারবো... বললো পারবি... আসলে ডাল গুলো বেশ রোগা ছিল বলে

ভরসা পাচ্ছিলাম না। বাবা বলাতে অমনি ডালে ভর দিলাম,তখন ধনুকের মত বেঁকে গিয়ে আবার সোজা হল... প্রথমটায় ঘাবড়ে গেলেও ব্যালেন্সটা ধরতে পেরে পুনঃ পুনঃ চলতে লাগলো.... খিলখিল হাসছি সঙ্গে বাবাও মেয়ের কান্ড দেখে হাসছে... বাপে মেয়েতে অনাবিল হাসি আনন্দের মাঝে হঠাৎ ঝঙ্কার ... মায়ের গলা... তাড়াতাড়ি নেমে এসে ঘরে দৌড়লাম। বাবাও গাছে জল দিতে লাগলো। বাবা আর আমার এই গোপন কর্মটি মা জানতো না।

পরের দিন মা যখন রান্নাঘরে ব্যস্ত। ভাই আয়নার সামনে ওয়টার কালার হাতে পেয়ে খাতার বদলে নিজেকে রাঙাতে ব্যস্ত। সেই সুযোগে গতদিনের পেয়ার গাছে দোল খাওয়াটা ঝালিয়ে দিতে উঠে গেলাম গাছে। যেদিকটাতে গাছটা ঝুঁকছে সেটা একটা খালি জমি কেবল আগাছার জঙ্গল আর ভাঙা শিশি বোতল কাঁটায় ভরা। যাই হোক গাছের ডালে উঠে যথাবিহিত মনের সুখে দোল খেয়েই চলেছি। খেয়াল করিনি কখন পাশের বাড়ির দিদা তাদের কলপাড়ে বাসন রাখতে এসেছিল। ব্যস যেই না আমাকে দেখেছে গাছের ডাল ধরে বেঁকে জঙ্গলের মধ্যে ঝুঁকছি আর উঠছি ওমনি খোনা গলায়..... সোমার মা ঐ দ্যাখ তোমার মেয়ে কি

করতাছে, একবার পইরা গেলে হাত পা ফালা ফালা হইবো.... দেখসনি কান্ডটা... ও সোমার মা...... মা তখন রান্না ফেলে বারান্দায়... হাতে আর কিছু না পেয়ে ভাঙা ঝুলঝাড়ুর লাঠি ....শুরু হল গোলা বর্ষণ.... ভয়ে কেঁচো হয়ে নীচে নামলাম গাছ থেকে। ভাগ্য ভাল লাঠিটা পিঠে পড়ে নি। কিন্তু তার থেকেও বিচ্ছিরি শাস্তি গল্প লেখা। বঙ্গলিপিতে শুধু আঁচড় দিয়েই চলেছি....লেখার বদলে দিদার একটা কিম্ভুত মুক আঁকার চেষ্টা করছি...ছাতা! সেটাও হচ্ছে না।

রান্নাঘর থেকে মাঝে মধ্যেই তোপ বর্ষণ চলছে ....আসুক তোর বাবা.....তারপর আরো কত কি মাথায় ঢোকে নি।

দুপুরে এই সুযোগে মা আমাকে ঢেঁড়শ সেদ্ধ, উচ্ছেভাজা দিয়ে ভাতা গেলাল। চোখের জল চেপে সে দুটি বস্তু যে কি করে গলার ওপারে....তা সেদিন ঈশ্বর বুঝেছিল। মায়ের একটা সুবিধে যে অন্য সময় মানে যখন আমি ভাল মেয়ে থাকি উচ্ছে আর ঢেঁড়শ আমাকে খাওয়াতে পারে না। কিন্তু যেদিন বদমাইশী করি তার শাস্তি স্বরূপ হয় উচ্ছে নয়তো দুটোই ঠিক খাওয়াবে। উচ্ছেটা প্রায় রোজই হত।

চুপচাপ শুয়ে পড়লাম।আর মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলাম দিদা কে "দেখে নেব"।দিদাদের গাছের পেয়ারাগুলো বেশ ডাঁসা হয়েছে....পেয়ারার ভেতর গুলো লাল।বাবা বলতো কাশীর পেয়ারা।সে যা হোক যখন বিকেলে খেলতে বের হব,একফাঁকে নিকেশ করবো,কারণ ঐ সময় দিদা রাস্তার দিকে ঘরে বসে কুরুশের নানা রকম জিনিষ বানায়।

চোখ টিপে শুয়ে আছি।চোখ খুললেই তো মায়ের গরম চোখ দেখতে হবে।কোনমতে চোখের কোণা দিয়ে দেখছি ঘড়ির দিকে।পনে পাঁচটা বাজতেই উঠে গেলাম। তারপর ড্রেস করে বারান্দায় বাকিরা এসেছে কিনা দেখতে। সবাই হাঁকডাক করতেই বেড়িয়ে গেলাম। আমাদের বাড়ির সামনেই পুকুর। পুকুরের একপাশে ক্লাব তার সামনে ফাঁকা ছোট্ট মাঠ। সেখানেই আমাদের খেলা। খোখো, বুড়ি বসন্তি, হাডুডু, গাদি, চোরচোর, ছোওয়া ছুয়ি, আরো কত কি।

তো সেদিন বললাম লুকোচুরি খেলতে হবে কারণটা জানিয়ে দিলাম...কি ভাবে পেয়ারাগুলো নিকেশ করতে হবে সবার মিলিত সিদ্ধান্তে স্থির হল।তারপর ছড়িয়ে পড়লাম। পনের মিনিটের মধ্যে সবার হাতে হাতে পেয়ারা ঘুরছে।

পরের দিন সকালে কলপাড়ে দিদার প্রলাপ বকা শুরু হয়েগেল... কাল সক্কালে দ্যখলাম কতগুলি ডাসা হইসে আইজ একডাও ফেয়ারা নাই। অপু অপু এই বলে নিজের ছেলেকে ডাকতে লাগলো... অপু কাকু ব্যাঙ্কে চাকরী করে.... সে বেড়িয়ে এসে গাছে কটা কষ্টি পেয়ারা দেখে বললো... গেছে তো গেছে অত চেচাই তাসো ক্যান.. ওগুলো তো খাইবার জন্য নিসে না কি? রেগেমেগে ঘরে ঢুকে যায়। ফাকা মাঠে দিদা খানিক চেঁচিয়ে সমব্যথী কাউকে না পেয়ে ঘরে ঢুকে যায়।

তখন আমার ভুরভুরিয়ে হাসি আর হাসি

মিসেস গোমস

সোমাদাস

ছাড়াছাড়িটা হয়েই গেল রণিতার। সাত বছরের বিবাহিত জীবনের ইতি পড়লো।শৈবাল যে ছয়মাস ধরে।অন্য একটি মেয়েতে অনুরক্তা সেটা টের পেলেও বিশ্বাস করতে পারেনি।ভেবেছিল কোন বান্ধবী, শেষে রণিতার বান্ধবীরাই ধরিয়ে দিল।তারপর.....কোন নাটক না করে সরাসরি বিচ্ছেদের কথাটা রণিতাই তুলেছিল। কারণ মুখকালাকালি করে সম্পর্কের ইতি টানার বদলে সসম্মানে সরে যাওয়াই তার কাছে ঠিক মনে হয়েছিল

আপাতত বাপের বাড়ির কোন ঠিকানা নেই।কারণ বাপের বাড়ি সুদূর জিয়াগঞ্জে ,বাবা মাকে এ ব্যাপারে জানিয়ে বৃদ্ধ বয়সে আঘাত দিতে মন চায় নি।ওই পাঁড়াগায়ে গিয়ে তাই তার থাকা হবে না সে কারণে।তাছাড়া ও একটা চাকরী করে।যদিও আহামরি তেমন নয়,শপিংমলের একটা শোরুমে ও সিনিয়র স্টাফ।মায়নে টা এখন কম মনে হচ্ছে।এতদিন দুজনে মিলে চলতো তাই কিছু বোঝে

নি।চিন্তা হল এই বাজারে ঐ মায়েনেতে ঘর ভাড়া দিয়ে পেট চালানোটা বেশ চাপের হবে তার কাছে।

আপাতত কিছুদিনের জন্য লেডিস হোস্টেল দেখবে,তারপর সুবিধে বুঝে একটা ঘর ভাড়া নেবে।বান্ধবীরাও দেখছে ওর জন্য ঘর।

লেডিস হোস্টেলে ওর এক বান্ধবীর গেষ্ট হয়ে এক রাতের থাকার অভিজ্ঞতা ওর ভালো লাগেনি। তাই মরিয়া হয়ে ঘর খুঁজতে লেগে পড়লো। দু একদিনের চেষ্টায় একটা ঘরের সন্ধান পাওয়া গেল।ওর অফিসের এক কলিগের কাছে ঠিকানাটা পেয়ে রুমিকে সাথে করে নিয়ে বেড়িয়ে পড়লো। রুমি তার বহু পুরোনো বান্ধবী এবং বেশ বলিয়ে কইয়ে। যাইহোক ঠিকানার সন্ধানে ঘুরে ঘুরে উত্তর কোলকাতার গলি তস্য গলির এক অখ্যাত ঘুপচি বাইলেনে ততোধিক বিবর্ণ এক ফ্ল্যাট বাড়ির সামনে এসে উপস্থিত হল।ফ্ল্যাটটা দেখেই দুজনের মন খুব খারাপ হয়ে যায়।আসলে নামেই ফ্ল্যাট ,দেখলে মনে হবে যুগ পেড়িয়ে গেছে ফ্ল্যাটটির গায়ে রঙের আঁচর পড়েনি।সামনে দিয়ে ঝোলান ছেঁড়া ফাটা তোষক,চাদর।চারিদিকে একটা হতশ্রীর ছাপ। এত বিশ্রী

বাড়ি আগে দেখেনি।একপাল বেড়াল খালি দৌড়ে বেড়াচ্ছে। যেটা রণিতা ভিষণ অপছন্দ করে।

দোতলায় একটা ঘরে বাড়িওলি মিসেস গোমসের দরজায় নক করে দশ মিনিট দাঁড়াবার পর ঘোলাটে চোখের মলিন একটা লং ফ্রক পড়া লোলচর্মসার বৃদ্ধা দরজা খুললেন।তিনবার বলার পর উনি বললেন বাড়ি ভাড়া কত দিতে হবে।টাকাটা ভীষণ কম...তাই হাতছাড়া করতে মন চাইলো না।মিসেস গোমসের সন্দিগ্ধ চাউনি রণিতাকে বেশ অস্বস্তিতে ফেলেছিল।রুমি বললো,ছাড় ঐ ঘোলা চোখে তোকে কি আর সন্দেহ করবে,তুই কি চোর না ডাকাত...ওর টাকা পাবার কথা সেটা পেলেই ওর চলবে।

যাইহোক কথা বিশেষ কিছুই হয়নি।মনে হল এই পার্থিব দুনিয়ায় প্রতি মিসেস গোমসের আর কোন আকর্ষণ নেই।কেবল উদর পূর্তির টাকাটা পেলেই....কিছু টাকা অ্যাডভান্স করে পরেরদিন শিফট করবার কথা বলে তারা বেড়িয়ে এল বাড়িটা থেকে।

বাড়িটার কাছাকাছি অন্য কোন বাড়ি নেই...আছে কেবল একটা বাগান তাও জঙ্গলে ঢাকা...একটু দূরে অন্যান্য

বাড়িঘর রয়েছে।তবে এই ফ্ল্যাটটার সামনে দাঁড়ালে মনে হয় যেন সময় এখানে কয়েক শতাব্দী আগে বন্দী হয়েগেছে যেন ব্ল্যাকহোলের মধ্যে বাড়িটি ঢুকেগেছে।

পরেরদিন শৈবালের ঘর থেকে ওর দরকারি এবং ওর নিজের পয়সায় কেনা কিছু আসবাবপত্র জামাকাপড় আরো কিছু যা ও নিজে ব্যয় করে কিনেছে সব নিয়ে বেড়িয়ে এল। চিরদিনের মত বের হওয়ার ক্ষণটি ওর কাছে ভীষণ কষ্টের ছিল সঙ্গে রুমি না থাকলে ও হয়তো এতটা সহজ ভাবে সামলাতে পারতো না।যাইহোক আপাতত গন্তব্য সেই বাইলেনের ফ্ল্যাটটি।

সারাদিন ধরে ওরা দুজনে মিলে বিবর্ণ ঘর খানাকে ভদ্রস্থ করতেই কাটিয়ে দিল।একটি বড় বেড রুম ,কিচেন সামনে ছোট্ট একফালি ড্রয়ংই রুম আর টয়লেট রুম।ওরা বুদ্ধি করে কিছু ওয়াল পেপার কিনেছিল তাই লাগিয়েদিল বেডরুমের দেওয়ালে।অবশিষ্টাংশ ড্রয়ংই রুমের ফালিতে।রান্নাঘরটিকে মেজেঘষে ঠিকঠাক করতে বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যে।তারপর দুজনে স্নান করে বেড়িয়ে পড়লো রাতের খাওয়া আনতে।আজকের রাতটা রুমি ওর সঙ্গেই থাকবে।

তন্দুরি রুটি আর তড়কা পেয়েগেল মোড়ের মাথায় ওটা আগের দিনই দেখে রেখেছিল। ফুটপাত থেকে সঙ্গে কিছু সবজি,কিছু মশলা তেল মানে রান্নাঘরের সরঞ্জাম কিনেটিনে একেবারে ঘরে এল।এরপর যখন যেমন প্রয়োজন হবে কিনে নেবে মনস্থ করলো। খানিক রাত অবধি বকবক করে ওরা শুয়ে পড়লো।

রাত কত হবে জানা নেই, তারস্বরে একদল বেড়ালের সমবেত ভয়ানক ডাকে রণিতার ঘুম ভেঙে যায়।ঘুম জড়ানো চোখে ভাবে নিজের চেনা ঘরেই রয়েছে। কিন্তু বেড়ালের প্রবল ডাকে বুঝতে পারে এটা তার ভাড়ার ঘর। ঘুম চোখে মাথার কাছে খোলা জানলাটা দিয়ে বাইরে চোখ যায়। চাঁদের ছায়াছায়া আলোতে দেখে ওই নিশুতি রাতে মিসেস গোমস রাস্তায় দাঁড়িয়ে....

আরো ভাল করে নজর করে নিশ্চিত হয় ...উনি মিসেস গোমস।কিন্তু এত রাতে কি করছেন.... ভারী কৌতুহল হয় রণিতার,পাশে শোওয়া রুমিকে ডেকে তোলে। তারপর দুজনে মিলে যা দেখলো তাতে তাদের ভেতর অবধি কেঁপে উঠলো।

মিসেস গোমস কে ঘিরে রয়েছে বেড়ালের দল।ওনার হাতে বিরাট বড় একটা জন্তু অনেকটা বড় ইঁদুরের মত... সেই জন্তুটার মাংস উনি ছিড়ে খাচ্ছেন আর টুকরো টুকরো করে বেড়ালদের মুখে ছুড়ে দিচ্ছেন। কাড়াকাড়ি করে বেড়ালগুলো ঐ মাংস খাচ্ছে।গোমসের চোয়ালের কষ বেয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। কোন একটা বেড়াল তার গায়ে উঠে সেই রক্ত চাটছে.... এই ভয়ানক দৃশ্য দেখার মত মানসিক জোড় তাদের ছিল না। দুজনেই জ্ঞান হারালো।

যখন ওদের জ্ঞান ফিরলো জানলা দিয়ে দিনের আলোয় ভরিয়ে দিয়েছে ঘরটিকে। গতরাতের দুঃস্বপ্ন নাকি সত্যি এই দিনের আলোয় তাদের হেঁয়ালির মত লাগছে। জানলা দিয়ে উঁকি মেরে বেড়ালগুলোকে দেখতে পেল না। এখন কি করবে রণিতা ভেবে কূল পাচ্ছে না। তাই ঠিক করলো গোমসের ঘরে গিয়ে দেখবে একবার ব্যাপারখানি।

ওরা তাড়াতাড়ি তিনতলা থেকে নেমে গোমসের ঘরের সামনে এসে দেখে একটা বড় তালা ঝুলছে। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, তালার গায়ে এবং দরজায় বহুদিনের ঝুলকালি ঢাকা। অথচ গতকাল যখন এসেছিল এসব কিছুই ছিল না।

কি হচ্ছে কিছুই বুঝতে পারা যাচ্ছে না। ঐ ফ্লোরে তারা একটা ঘরের দরজা নক করলো। এক পার্শি বয়স্ক মানুষ দরজা খুলে মুখে প্রশ্নচিহ্ন ঝুলিয়ে তাদের দিকে তাকিয়ে রয়েছে।অতি সংক্ষেপে রুমি জানাল যে তারা এ বাড়ির নতুন ভাড়াটে। বাড়ির মালিকের সম্পর্কে তারা জানতে পারলো যে এই বাড়ির মালিকেরা চারভাই।প্রত্যেকের নিজ নিজ ভাড়াটে রয়েছে।যেমন ওনাদের বাড়িওয়ালা পেড্রু গোমস।তখন তাকে হাত দেখিয়ে তালা বন্ধ ঘরটির বিষয়ে জানতে চাইলে উনি কিছু বলতে অস্বীকার করেন এবং মুখের ওপর দরজাটা লাগিয়ে দেন।

যাবতীয় তথ্য থেকে তারা এটুকু বুঝলো যে মিসেস গোমস বুড়ি হলে কি হবে তিনি একজন রহস্যময়ী মহিলা।ওনার সাথে বাড়ির কেউ কোন যোগাযোগ রাখে না বা ভয়ে এড়িয়ে চলে।কিন্তু তাদের একটা ব্যাপার স্পষ্ট হল না যে ঐ ঘরে আদৌ মিসেস গোমস থাকে কিনা। কারণ তার কাছেই টাকা দিয়ে ওরা ঘরটি ভাড়া নিয়েছে।

রুমি তো কিছুতেই রণিতাকে এই ঘরে একলা রাত কাটাতে দেবে না।তাই সে বাড়িতে ফোন করে জানিয়ে দিল।গতকালের ঘটনার জন যথারীতি রণিতা অফিস যেতে

পারলো না।অবশ্য কটা দিনের অসুবিধের কথা ও জানিয়ে রেখেছিল।ওরা ঠিক করলো আজকের রাতটা দেখে ঠিক করবে ভবিষ্যতের প্ল্যান।সেরকম হলে টাকার গুনগার দিয়েই বাড়িটা ছেড়ে আবার সেই লেডিস হোস্টেলে সবার সঙ্গে শেয়ার করে জীবন কাটানোর পথটা খোলা রইলো।

ওরা তাড়াতাড়ি খেয়ে শুয়ে পড়লো। কিন্তু ঘুমকি অত সহজে আসে। একরাশ ভয় বুকের মধ্যে নিয়ে কি ঘুম হয়? কিন্তু সত্যি ওরা ঘুমিয়ে পড়েছিল। আবার ঠিক নিশুতি রাতে বেড়ালের বীভৎস চিৎকারে ওদের ঘুম ভেঙে যায়। তেড়ছা চাঁদের আলো ওদের ঘরের দেওয়ালে আলো আঁধারির জাফরি কেটেছে। সেদিকে তাকিয়ে ওদের হৃদকম্পন থেমে যাবার জোগার ....দেওয়ালে মিসেস গোমসের ছায়া! ছোট্ট থেকে ক্রমশই দীর্ঘতর হচ্ছে ছায়াটা ....ঘাড়ের ওপর বেড়াল...ছায়ার মধ্যে তার চোখ জ্বলছে! হঠাৎ ঘরের মধ্যে চামসে একটা গন্ধ টের পেল। ওদের দম বন্ধ হয়ে যাচ্ছে গন্ধে।

নিজের চোখকেও তারা বিশ্বাস করতে পারছে না... মিসেস গোমস ওদের ঘরের মধ্যে!আরে ওর পেছনে রান্নাঘরে কে?ধোঁওয়ার মত একটা আবছা মানুষের ছায়া...

একটা নয়, অনেকগুলো ছায়া।বিস্ফোরিত চোখে ওরা একে অপরকে জড়িয়ে ওসব চাক্ষুস করতে লাগলো। হঠাৎ ছায়া মানুষগুলো একজোট হয়ে মিসেস গোমসকে ঘিরে ধরলো.....তারপর চললো এলোপাথারি প্রহার....বেড়ালগুলো প্রবল চেঁচাচ্ছে লোকগুলোর গায়ে আঁচড়াচ্ছে কামড়াচ্ছে। গোমস রক্তাক্ত ....হাঁপিয়ে লোকগুলো বসে পড়লো মাটিতে...রক্তস্নাত মিসেস গোমস এবার লোকগুলোর হাত পা কামড়ে খেতে লাগলো....একসময়সে সব খেতে খেতে মিসেস গোমসের চোখ ওদের দিকে পড়লো .... প্রবল ভয়ে বিস্ময়ে ওদের চেতনা লোপ পেল...

যখন চেতনা এল ওদের,দেখতে পেল ঐ পার্শি ভদ্রলোক ওদের মাথার কাছে বসা।খানিকটা সুস্থ হবার পর ...ওরা চেপে ধরলো ওনাকে,জোড় করলো বলতেই হবে আসল কথা...গতরাতে যে ঘটনার সম্মুখিন হয়েছিল তাতে তাদের মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারতো...তখন উনি যে গল্পটা বললেন তা শুনে ওরা এক দন্ড এখানে না থাকার প্রতিজ্ঞা করলো।

ঘটনা হল মিসেস গোমস এক বিরল স্নায়ুতন্ত্রের ব্যাঘাতজনিত রোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন।যারজন্য তিনি কাঁচা মাংস খেতেন। যেদিন জ্যান্ত কুকুর বেড়ালের বদলে

ছোট শিশুর মাংস খেল। সেদিন তাকে পরিবারের লোকেরা পিটিয়ে মারে।ভাবে মরেগেছে, কিন্তু দেখা যায় সে মরে নি বরং নিজের বরের মাংসই খেতে শুরু করেছে। তখন নিরুপায় হয়ে তাকে ঐ ঘরের মধ্যে মেরে ফেলা হয়। এখনো তাই ওর অতৃপ্ত আত্মা ঘুরে বেড়ায়।

এ ঘটনা শুনে ওরা বাকরুদ্ধ...
তবুও তাদের মনে প্রশ্ন...তবে ওদের টাকা কে নিয়েছিল আসল গোমস নাকি মিসেস গোমসের প্রেতাত্মা।বলাই বাহুল্য তারা এই প্রশ্নের উত্তর খোঁজার অপেক্ষা করেনি।সেদিনই ঘরটি তারা ছেড়ে চলে যায়।

ইনি কে?

সোমা দাস

সেদিনটার কথা আজো ভুলতে পারি না।সময়টা ছিল শীতকাল,এনোয়াল পরীক্ষা শেষ,পশ্চিম পুটীয়ারীর মাঠে সুভাষ মেলায় সার্কাসের তাঁবু পড়েছে।এক রবিবারে বাবার সঙ্গে ভাইবোন বেড়িয়ে পড়লাম সার্কাস দেখতে।কোন কারণে মায়ের যাওয়া হয় নি।

সার্কাস দেখে একটু মেলা ঘুরে বাড়ির পথ ধরেছি,সঙ্গে নিয়েছি মায়ের জন্য চিনে বাদাম ভাজা,সবার জন্য জিলিপি,মালপোয়া....একদম গরম গরম ভাজা।ঠিক মেলা থেকে বের হবার মুখে কোথায় একটা ঢোলের শব্দ শুনে ভাইয়ের বায়না তার ঢোল চাই।অগত্যা বাবা আমাকে বাসস্ট্যান্ডর দিয়ে এগিয়ে যেতে বলে ভাইকে নিয়ে ছুটলো ঢোল কিনতে।

আমার দু হাতে খাবার দাবার ভর্তি। সে সময়ে এদিকে এত লোক সমাগম ছিল না। মেলার জায়গাটুকু বাদ দিলে বাকি এলাকা ফাঁকাই।তো আমি একলাটি চলেছি।বাঁদিকে

বাসস্ট্যান্ড... ছোট্ট একটা ব্রীজে উঠতে হবে...তার আগেই একটা বিশাল ঝাঁকড়া বট গাছ রয়েছে।তার পাশ কেটেই যেতে হবে।

গাছটার ডানপাশের রাস্তাটা ধরলে আমার শর্টকাট হয়।একদম বাজারের মধ্যে দিয়ে গিয়ে পুর্ব পূটিয়ারীর রাস্তা।এদিকে গরম জিলিপি আর মালপোয়া ছ্যাকাতে আমার অবস্থা কাহিল।তাই শর্টকাট ধরলাম।

ডানপাশের রাস্তাটায় কোন আলো নেই,খালের ধার ঘেসে ....দূরে বাসস্ট্যান্ডের আলো চোখে পড়ছে।দু কদম এগোতেই... শুনতে পাচ্ছি ....তুই মন্টুদার মেয়ে না....ঘুরে তাকিয়ে দেখি কানাই কাকু, ..হ্যা বললাম। সে সময়ে পাড়া তুঁতো কাকা জ্যাঠারা ডাক খোঁজ নিত ।তাই আমায় একা দেখে বললো,এই অন্ধকার দিয়ে একা যাচ্ছিস চল তোকে এগিয়ে দিই....আমি একা যেতে পারবো বললাম....কিন্তু কোন কথাই শুনলো না....জানিস এদিকটা একটু আগেই গোলাগুলি ছুটেছে আর তোর বাবা তোকে একা ছেড়ে দিল? আমি চুপ ,ভাল করে তাকিয়ে দেখি কাকুর সারা শরীরে কাঁদায় ভরা যেন পাঁক থেকে উঠে এসেছে।কিছু

বললাম না পাছে আবার বকুনি খাই। মনে হয় কপালের পাশ দিয়ে রক্ত ও ঝড়ছে।

বাজারের দোকানে ঝাঁপ বন্ধ....হঠাৎ কাকা বললো, নে তোর বাবা আসছে তুই এগো আমি আসছি।বাসস্ট্যান্ডের রাস্তায় আমাকে না পেয়ে চিন্তিত মুখে বাবা এগিয়ে আসছে।বাজারের মুখে আমায় দেখে বকতে যাবে সে সময়ে দেখি পেছন থেকে একদল লোক লাঠিসোটা নিয়ে দৌড়ে আসছে।বাবাকে দেখে বললো,কানাইকে বে পাড়ার কিছু লোক তুলে নিয়ে গেছে,আমরা যাচ্ছি ছাড়িয়ে আনতে....ওরা না দাঁড়িয়ে দুদ্দার করে ছুটলো।কানাই কাকু যে আমাকে একা দেখে রাস্তাটা পাড় করে দিল সেটা বাবাকে বললাম।বাবা তখন চেঁচিয়ে বলে দিল ওদের বাজারের পথে যেতে।কে জানে শুনতে পেল কিনা।

যাই হোক পরেরদিন সকালে বাবার সঙ্গে বাজারে যাচ্ছি।মাছ বাজারের মুখে জটলা,শুনতে পেলাম কানাই কাকুকে কে বা কারা গত সন্ধ্যার মুখে গুলি করে খালের পাঁকে পুঁতে রেখেগেছে।অথচ সন্ধ্যের মুখে আমাকে তো রাস্তা পাড় করে দিল।

ভালবাসা

সোমা দাস

খোয়াইয়ের ধারে হাঁটতে হাঁটতে চলে এসেছে রঞ্জন।দূর থেকে ধামসা মাদলের শব্দ ভেসে আসছে কানে।কাঁধে ঝোলান ব্যাগে তার আঁকার সরঞ্জাম,হেঁটে খানিকটা সামনা সামনি আসতে দেখতে পেল একদল সাঁওতাল রমনী মাথার খোপায় কৃষ্ণচূড়া গুজে মাদলের তালে তালে শরীর দুলিয়ে একে অপরের কোমড় জড়িয়ে নেচে চলেছে।মাদলের শব্দে আর নাচের ছন্দে এমন এক নেশা রয়েছে যা পঞ্চ ইন্দ্রিয় কে ঘোর লাগিয়ে দেয়।যেমন ঘোর লাগিয়ে দিয়েছে রঞ্জনকে।সামনেটাতে অনেক লোকের ভিড়,তারা ক্যামেড়া মোবাইলে পটাপট ছবি তুলে চলেছে।রঞ্জন ভিড় টা এড়িয়ে একটু দূরে গাছের তলায় বসে ওদের নাচ দেখছে।একটা সময় নাচটা থেমে যেতে ভিড়টাও আসতে আসতে কমে যায়।কিন্ত ঐ নাচের দলের মধ্যে থাকা একটি মেয়ের দিকে তার চোখটা আটকে যায়। মেয়েটি যেন সবার থেকে আলাদা।খোঁপায় তার লাল জবা,পায়ে তার মোটা রূপার মল, হাঁটাচলার ভঙ্গিও সবার থেকে আলাদা,বেশ দৃপ্তময়ী।বেশ ভাল লাগল ঐ

ব্যতিক্রমীকে দেখে। রঞ্জনের আঁকায় আর মন নেই,বারে বারে চোখ চলে যাচ্ছে তার দিকে।মেয়েটিও মনে হয় বুঝতে পেরেছে।নাচ থামার পর সব লোক চলেগেলেও কেবল ঐ ছেলেটি বসে তাদের দেখছে।বার দুয়েক ছেলেটির সাথে চোখাচুখি হল।কিছু না ভেবেই মেয়েটি রঞ্জনের দিকে এগিয়ে গেল।তাকে আসতে দেখে রঞ্জন অপ্রস্তুতে পড়ে উঠে না দাঁড়িয়ে পারলো না। মনে মনে ভাবছে সে, নিশ্চয়ই মেয়েটি তার এই হ্যাংলামির জন্য কিছু বলতে আসছে।

মেয়েটি কাছে এসে তাকে বললো, 'আপনাকে এদিকে নতুন দেখছি।সবাই চলেগেছে অথচ আপনি....ভাবলাম আমাদের সম্পর্কে আপনার আলাদা কোন কৌতুহল রয়েছে অথবা নিছক এমনি, তাই আপনার সঙ্গ আলাপ করতে এলাম।নমস্কার আমি মহুয়া, শান্তিনিকেতনে কলা বিভাগের ছাত্রী,ইতিহাসে বি এ ফাইনাল ইয়ার'। রঞ্জন ওর কথা শুনে অবাক হয়েগেছে, ওর কোন ধারনাই ছিল না যে এদের মধ্যে এত শিক্ষিত থাকতে পারে। যাইহোক প্রতি নমস্কার জানিয়ে সে বললো, 'আপনি ঠিকই অনুমান করেছেন,আমি এখানে নতুন, বলতে পারেন আজকে প্রথম এলাম শান্তিনিকেতনে, খোয়াইয়ের কথা শুনে চলে এলাম ছবি

আকঁতে,এটা আমার নেশা। এই যে ঝোলা দেখছেন এতেই সব সরঞ্জাম রয়েছে'। 'আচ্ছা একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে পারি যদি কিছু মনে না করেন', বললো রঞ্জন'। 'বলুন না',

...না আপনি শান্তিনিকেতনের ছাত্রী বললেন তবে এখানে এদের সাথে নাচ... ঠিক বুঝতে পারছিনা...., হাসতে হাসতে মহুয়া বললো, 'আমিও যে সাঁওতাল, নাচ আমার রক্তে, তাই না নেচে থাকি কি করে বলুন। আমার বাড়ি বাঁকুড়ায় সেখানে বিভিন্ন পরবে আমাদের নাচ গান লেগেই থাকে। তাই মাঝে মাঝে সেসব ঝালাই করতে এখানে চলে আসি। আচ্ছা চলি আবার দেখা হবে', বলে মহুয়া চলে গেল।তার যাবার পথের দিকে তাকিয়ে রইল রঞ্জন। আজ তার আঁকার মুড নেই।অমন উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা,কালো চুল,বড় বড় টানা দীঘল চোখের মেয়েটি আজ তার সমস্ত চেতনা জুড়ে ছেয়ে গেছে,ওর কথাই ভাবতে ভাবতে গেষ্ট হাউসের পথে পা বাড়াল।

সত্যি ওদের দুজনার পরপর বেশ কয়দিন দেখা হয়েগেল। প্রতিবার অবশ্য শান্তিনিকেতনের প্রাঙ্গনের ভিতরেই হল।আসলে এখানে পড়ে শোনার পর রঞ্জন এদিকে ঢু

মেরেছে, তাই দেখাটা অবধারিত ছিল। আলাপটা ওদের মধ্যে বেশ জমে উঠেছে। কথায় কথায় তারা একে অপরের প্রতি অনেক কথাই জানতে পারলো। এই যেমন রঞ্জন একজন উড়িয়া ব্রাম্ভনের ছেলে, নাম রঞ্জন নন্দা, বাড়ি কাথিঁ।বাবার বিশাল ব্যবসা,হিমঘর থেকে শুরু করে হোটেল কি নেই ব্যবসায়ের তালিকায়।দু ভাইয়ের মধ্যে সে ছোট।অবশ্য রঞ্জন ব্যবসার দিকটা একদম পছন্দ করে না।তার ভাল লাগে কেবল ছবি আঁকতে।কিন্তু রাশভারী বাবার সামনে মুখ ফুটে কিছু বলতে পারে না। তাই তো সুযোগ পেলে রঙ তুলি নিয়ে দূরে কোথাও চলে যায় যেখানে নিজের মত রঙ দিয়ে ভরিয়ে দেয় ক্ষনিকের ভাললাগাটুকু। এই যেমন করে আজ সে এখানে চলে এসেছে।

মহুয়া কুজুড়, বাড়ি বাকুড়া জেলার এক ছোট্ট গ্রামে, যেখানে এখন তার মা রয়েছে।বাবা মারাগেছেন বহুদিন। মহুয়া এখানে বিএ পরীক্ষা দিয়েই চলে যাবে মায়ের কাছে। সে বিভিন্ন সামাজিক আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত।তাদের অলিচিক ভাষায় যাতে পঠনপাঠন হয় সেই নিয়ে অনেকদিন ধরে লড়াই করে যাচ্ছে। শুধু তাই নয়,তাদের এই প্রত্যন্ত গাঁয়ে অনেক সরকারী প্রকল্পের সুবিধা থেকে বঞ্চিত তার গাঁয়ের মানুষ। সেই সুবিধা আদায়ের জন্য ও

তারা লাগাতার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।সাঁওতাল ছাড়াও আরো কিছু পিছিয়ে পড়া আদিবাসী জনগোষ্ঠীদের শিক্ষা স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতনের কাজটিও তারা করছে।

তাদের দুজনের এই কদিনের আলাপে একে অপরকে জেনে নেওয়াতে তাদের আলাপটা কখন ভাল লাগাতে পরিণতি পেল সত্যি তারা বুঝতে পারেনি।একে ই কি প্রেম বলে?না হলে রঞ্জনের যাবার দিনে দুজনের মনে এত তীব্র বেদনা কোথা থেকে আসে। বিচ্ছেদের বেদনায় দুজনে হৃদয়েই ক্ষরণ হচ্ছে।তাইতো রঞ্জন খুব শীঘ্র ফিরে আসার অঙ্গিকার করে বিদায় নেয়।মহুয়াও হৃদয়ের ক্ষরণ নিয়েই ফাইনাল পরীক্ষার প্রস্তুতিতে ডুব দেয়।

মহুয়ার পরীক্ষা শেষ হয়েছে।রঞ্জনের জানাছিল তাই সেও কাজের একটা বাহানা দিয়ে কাঁথী থেকে চলে আসে।এতদিন তার শরীরটাই ছিল কাঁথী তে তার সমস্ত মনটাই ছিল শান্তিনিকেতনে।দীর্ঘ বিরহের পর মিলন বড়ই মধুর হয়।তারা এ কয়দিনেই একে অপরকে গভীর ভাবে ভালবেসে ফেলেছিল।তাইতো খোয়াইয়ের ধারে ধারে সোনাঝুরির মাঠে কোপাই নদীতে জেলেদের নৌকায় নিভৃতে প্রেম করেগেছে।পরস্পরের প্রেমে মজেছে মন,

প্রেমের নিয়মে মিলেছে শরীর। কিন্তু গভীর প্রেমের বন্ধনেও আটকাতে পারলো না রঞ্জনকে। ছেদ পড়লো প্রেমে, আবার কর্মস্থলে ফিরে যেতে হল তাকে,আবার করল শীঘ্র ফিরে আসার অঙ্গীকার।

রঞ্জনের মন নেই ব্যবসায়ে কাজে।হিসেবের ভুল ধরা পড়ছে বারেবারে। তার এ হেন আচরণ ব্যবসায়ী বাবার নজর এড়ায়নি। তিনিও ছেলের আচরনের তফাৎটা লক্ষ্য করেছিলেন শান্তিনিকেতন থেকে ফেরার পরপরই। ব্যবসায়ী মানুষ তিনি, সবকিছুই তোলমোল করে দেখে নেন। কাজেই এটাই বা অদেখা করেন কি ভাবে।মস্ত প্রভাবশালী,লোক লাগিয়ে খবর নেওয়া এর আর এমন কি কঠিন কাজ তার কাছে। সব জেনেও তিনি মুখে কিছু প্রকাশ করেন নি। এক সাঁওতালি মেয়ের প্রতি মন মজিয়ে বসে আছে জগন্নাথ নন্দার ছেলে? এটা তিনি হতে দেবেন কি করে।তাই তিনি তার ছেলের প্রেমের ভূত তাড়ানোর জন্য পাকা ব্যবস্থা করলেন। ছেলে আঁকতে ভালবাসে, তাই সেই আঁকা শেখানর জন্য তাকে প্যারিসে তার ছোটকাকা থাকে তার কাছে পাঠিয়ে দিলেন। দূরে থাকলেই ভুলে যাবে,তাছাড়া তলে তলে সেখানে এক ব্যবসায়ী বন্ধুর

মেয়ের সঙ্গে বিয়ের ব্যবস্থাও পাকা করে তবে স্বস্তি পেলেন।

রঞ্জনের পক্ষে বাবার কথা অমান্য করা দুসাধ্য ছিল। তাই তাকে চলে যেতে হয়। সে যাবার আগে শান্তিনিকেতনের গেষ্টহাউসের ছেলেটিকে গোপনে ফোন করে জানিয়ে দেয় মহুয়াকে জানানর জন্য। এদিকে মহুয়াকেও হোস্টেল ছেড়ে দিতে হবে। হঠাৎ গেষ্ট হাউসের ছেলেটি এসে জানিয়ে গেল রঞ্জনের কথা। তাই আর এখানে তার জন্য অপেক্ষা করার কোন অর্থ নেই। মায়ের কাছে চলে যাবার মনস্থ করল। রঞ্জন ওকে অপেক্ষা করতে বলে গেছে। এই বিশ্বাস নিয়ে সে বাড়িতে ফিরে গেল।

ফিরে এসে মহুয়া নিজেকে নানা কাজে ডুবিয়ে দিল। কারণ রঞ্জনকে ভুলে থাকতে হলে এ ছাড়া উপায় নেই। অপেক্ষা কত দিনের তা তার জানা নেই। তার বিশ্বাস খুব শীঘ্রই রঞ্জন তার কাছে ফিরে আসবে। দিন নেই রাত নেই ছুটে চলেছে সে। কোথাও মিটিং, তো কোথাও মিছিল, আলোচনা সভা, স্বাস্থ্য শিবিড়। এইভাবে রুটিন হয়ে যায় তার জীবন।

এই রকমেই চলছে তার জীবন। একদিন এক মিছিলের সমাবেশে মাথা ঘুড়ে পড়ে যায় সে।তাকে ধরাধরি করে একটা দোকানে বসিয়ে জলটল দিয়ে সুস্থ করে তোলা হয়।ফিরে আসে বাড়িতে।এই কয়মাস ধরে নিজের দিকে তাকাতে পারেনি সে।নাওয়া খাওয়ার সময়ের ঠিক ছিল না তার তাই মায়ের হুকুমে কটাদিন বাড়িতে বিশ্রাম নিতে হচ্ছে তাকে।

এই সাঁওতাল পল্লীর ভেতরে বেশ কিছুকাল আগে বাশঁ কাঠের একটা চার্চ বানান হয়।সেখানে পাদরীরা এসে আদিবাসী মানুষদের লেখাপড়া শেখায়,অসুস্থ হলে বিনা পয়সায় চিকিৎসাও করে দেয়।এই নিয়ে সাঁওতাল পল্লীর অন্দরে অসন্তোষের মেঘ জমতে শুরু করে।এখানে সাঁওতাল ছাড়াও বেশ কিছু অন্তজ শ্রেনীর মানুষ রয়েছে যার আবার ওই ধর্ম গ্রহন করেছে।সেটাই আসল রাগের কারণ।মহুয়ার কাছে এসেছিল এসব নিয়ে বলতে,সে আমল দেয় নি এসব।কারণ তার মনে হয়েছে এ সময়ে ধর্ম ছাড়াও আরো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রয়েছে সেদিকে নজর দেওয়া বেশী জরুরী।এখনো তাদের সমাজে প্রচুর মানুষ অশিক্ষিত।তাদের শিক্ষার আলো দেখানোটাই বড় চ্যালেঞ্জ।

তাই সে ওদের কথায় গুরুত্ব দেয় নি। তাই খানিক রাগ রয়েছে তার ওপর।

কদিন ধরে শরীরটা ঠিক যাচ্ছে না তার।একটা গা গুলানো সঙ্গে মাথা ঘোরা ভাব।কাজ করতে অনীহা।তাই ওর মা প্রায় জোড় করে মেয়েকে নিয়ে যায় ডাক্তারের কাছে।সেখানে গিয়ে জানতে পারে মহুয়া সন্তান সম্ভবা।তার মা এর মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ে এ খবরে।কিন্তু মহুয়া খুশীতে ফেটে পড়ে।তার আর রঞ্জনের ভালবাসার ফলটি এখন একটু একটু করে বাড়বে তার গর্ভে। এখন তার আনন্দের সীমা নেই। সে কোন কথা গোপন করেনি মাকে। রঞ্জনের কথা, তাদের ভালবাসার কথা, তাকে অপেক্ষা করে থাকার সব কথা বলে তার মাকে। কিন্তু তাতে কি মায়ের দুশ্চিন্তা যায়। কারণ কুমারী মাতৃত্ব কে মেনে নেবার মত এত শিক্ষিত হয়নি তাদের সমাজ। এ জিনিষ বেশী দিন চেপে রাখা যাবে না। তাই খুব শীঘ্র অন্য জায়গায় চলে যেতে হবে। মহুয়াও ব্যাপারটার গুরুত্ব বুঝে অনাগত ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়ে। এই সময়ে আর বেশী করে আজকে রঞ্জনের কথা মনে পড়ছে। এই খুশীর খবরটা তাকে জানাতে পারলো না। এই ভেবেই ঘুম আসছিল না তার চোখে। এমন সময় বাইরে প্রচুর আলো

দেখতে পেয়ে বাইরে বেড়িয়ে দেখে যে চার্চ টিতে আগুন লেগে গেছে। কি ভাবে লাগলো,বা কেউ লাগাল কিনা কিছু বুঝতে পারছিল না। আচমকা এরকম দৃশ্যে হকচকিয়ে যায়। কিন্তু মুহুর্তে ভেবে নেয় তাকে কি করতে হবে।বাঁচাতে হবে ভেতরে থাকা মানুষ গুলোকে। ও জানেনা ভেতরে কারা আছে। নিজের শারীরিক অবস্থার কথা বিন্দুমাত্র না ভেবে ঝাঁপিয়ে পড়লো সে। ভেতরে চিৎকার শুনতে পাচ্ছে। বাঁশ কাঠের চার্চ টি আগুনের তাপে আলগা হয়ে খসে পড়ছে এদিক ওদিক। কারুর অপেক্ষা না করেই সে পেছন দিক দিয়ে ঢোকার চেষ্টা করলো। সেদিকটা আগুন পৌছায়নি। অনেক কষ্ট করে ভেতর থেকেদুজন বয়স্কা নানকে কে উদ্ধার করতে পারলো। বাইরে বেরিয়ে দেখলো লোক জড়ো হয়েগেছে। আতঙ্কিত দুজনকে মহুয়া নিজের বাড়িতে সে রাতে নিয়ে এল।

পরের দিন সকালেই অগ্নিকান্ডের খবর পেয়ে সবচেয়ে বড় চার্চ থেকে ফাদার ডিসুজা ছুটে আসেন তাদের বাড়িতে। এভাবে জীবনের বাজি নিয়ে তাদের কে বাঁচানোর জন্য বারেবারে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। এখানকার অবস্থা সম্পর্কে তিনি ও ওয়াকিবহাল ছিলেন। তাই বয়স্কা সিস্টারদের এখানে থাকা তিনি নিরাপদ মনে করলেন না।

তিনি মহুয়াকে ও সঙ্গে যেতে অনুরোধ করলেন। মহুয়ার মাও চাইছিল মেয়ের এই অবস্থা প্রকাশের আগে এখান থেকে চলে যেতে তাই তিনি ফাদারের প্রস্তাবে রাজী হয়ে যান। প্রত্যেকে কোলকাতায় মাদার হাউসে গিয়ে ওঠে। তারপর সেখান থেকে মহুয়া আর তার মাকে গোয়ায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়। শুরু হয় মহুয়ার এক নতুন জীবন।

আজ পানাজিতে তারা রয়েছে প্রায় চার বছর হতে চললো। সেখানে একটা ফুটফুটে মেয়ের জন্ম দেয়,নাম রাখে তার মিলি। একরত্তি মেয়ে নাকানি চোবানি খাওয়ায় সবাইকে। মিলি তার দিদার সঙ্গে এক রেসীডেন্সিয়াল মিশনারী স্কুলে থাকে। মহুয়া থাকে একটু দূরে সেখানে মাদকাসক্ত দের পুনর্বাসনের কাজ করে। সপ্তাহান্তে মিলি তার দিদার সঙ্গে মায়ের কাছে চলে যায়। ব্যস এই ভাবে চলছে তাদের জীবন।এই সব ব্যবস্থা হয়েছে ফাদার ডিসুজার সৌজন্যে।

মিলি গোটা স্কুলে প্রজাপতির মত দৌড়ে বেড়ায়। কচি গলায় অস্ফুট উচ্চারণ এ সবার মন জয় করে নিয়েছে। মিলি একমাত্র শান্ত থাকে যখন ওকে খাতা পেন্সিল দিয়ে আঁকতে বসিয়ে দেওয়া হয়। আঁকতে ভিষন ভালবাসে মিলি। খাতার পাতায় রঙ পেন্সিলের আঁচড়ে ফুটিয়ে তোলে

ফুল পাতা হাবিজাবি আরো কত কি। নতুন একজন আঁকার স্যার এসেছে মিলিদের স্কুলে। স্যার রডরিখ। তার ক্লাসে সব দুষ্টু বাচ্ছা একেবারে শান্ত। প্রথম দিনেই তিনি সবাইকে বাইরে বাগানে বসিয়ে ক্লাস নিয়েছেন। তাই মিলি ভিষন খুশী। খুব ভাল লেগেছে নতুন স্যারকে।

মিলি যখন মায়ের কাছে যায় তখন তার মনে জমে থাকা হাজার প্রশ্ন করে। মিলি তাকে জিজ্ঞেস করে তার বন্ধুদের বাবা আছে তার বাবা কোথায়। মহুয়া মিলির মানসিক জগৎটাকে উপলব্ধি করতে পারে। তাকে মিলি বলে যে তার বাবা কি রডরিখ স্যারের মত ভাল, তাকে কি আঁকতে দেবে। মহুয়া তাকে বাবার গল্প শোনায়। বলে সে বিদেশে থাকে, মিলি যখন একটু বড় হবে তার বাবা তার কাছে চলে আসবে।আজ কতগুলি বছর কেটে গেল তার।তার মনে বিশ্বাস আছে রঞ্জন তার কাছে নিশ্চয়ই ফিরে আসবে। কারণ তার অপেক্ষায় আজো সে পথ চেয়ে বসে আছে। মনে মনে ভাবে সামনেই মিলির পাঁচ বছরের জন্মদিন।ও যখন রডরিখ স্যারকে এত ভালবাসে তাকে মিলির খুশির জন্য জন্মদিনের নেমতন্ন করে আসবে।

মহুয়া আজ মিলির স্কুলে এসেছে রডরিখ স্যারকে নেমতন্ন করতে।ভিজিটার্স রুমে বসে আছে সে। রডরিখ স্যার ঘরে ঢুকে তার সামনে এসে দাঁড়াতে ......সেই কালো দীঘল চোখে আটকে গেল......পাঁচ বছর পিছিয়ে গেল এক লহমায়.....মহুয়া তাকে দেখে বাগরুদ্ধ......চোখে নেমেছে শ্রাবণের ধারা.....এভাবে এই খানে এত কাছে...অথচ কেউ কাউকে দেখতে পায় নি..... স্থান কাল পরিস্থিতি ভুলে রডরিখ ওরফে রঞ্জনের বুকে ঝাপিয়ে পড়ল....এত বছরের অদর্শন,না পাওয়ার বেদনা, নিবিড় আলিঙ্গনে সব কষ্টকে যেন দুজন একে আপরের থেকে শুষে নিতে চাইল।কতক্ষন কেটে গেছে তারা জানে না। আজ এই আনন্দ ঘন মুহুর্তে রঞ্জন জানাল তার বাবা কিভাবে তাকে মিথ্যা বলে প্যারিসে বিয়ের ব্যাবস্থা করেছিল। কিভাবে সে ওখান থেকে পালিয়ে বাঁকুড়ায় তাদের গ্রামে যায়।সেখানে কেউ তাকে মহুয়াদের খবর দিতে পারে না। তখন বাবার হাত থেকে বাঁচতে নাম ভাড়িয়ে গোয়ায় চলে এসে এই স্কুলে চাকরীটা জোগার করে।মহুয়া তাকে আরো একটা আনন্দের খবর দেয়। তাকে বলে যে তার প্রিয় ছাত্রী আসলে তারই সন্তান।এতদিন নিজের বাবার স্নেহ পেয়ে আসছিল নিজেদের অজ্ঞাতে। একসাথে একজোড়া খুশীর খবরে রঞ্জন আর স্থির থাকতে পারছে না নিজের সন্তানকে বুকে

নেবার জন্য।কিন্ত সে একটু ইতস্তত, কিভাবে রঞ্জন ওরফে রডরীখ মিলির সামনে নিজের পিতৃত্বের পরিচয় দেবে।মহুয়া তাকে আশ্বস্ত করে বললো যে মিলির চোখে বাবার যে ছবিটা গড়ে উঠেছে তা রডরীখ কে দেখেই।সে বোঝে বাবা মানে রডরীখ স্যারের মতই হবে। মিলির ছুটির সময় হওয়াতে মহুয়া তাড়াতাড়ি চলে গেল। কারণ আগামীদিন টা তার মেয়ের জীবনে খুব গুরুত্বপূর্ণ দিন। এবারে সে রডরীখ ওরফে রঞ্জন কে বাবা হিসাবে চিনবে। তাই একটা মানসিক প্রস্তুতি দরকার।

***ছুটির পর মিলিকে নিয়ে বাড়িতে চলে আসে।তার হাতে একটা খাম তুলে দিয়ে বলে তার বাবা এটা পাঠিয়েছে ।মিলি খুশীতে নাচতে নাচতে খামটা খুলে দেখে একটা রঙীন প্রজাপতির ছবি...বলে মা বাবা কি করে জানল আমি প্রজাপতি ভালবাসি.....আজ বাবা এলে তুমি নিজেই তাকে জিজ্ঞেস কোরো...ঠিকাছে বলে দৌড়ে দিদাকে দেখাতে চলেগেল।

***সকাল হয়েছে মিলি ঘুম থেকে উঠে দেখে ঘরের দেওয়ালে রঙীন প্রজাপতির ছবি.....বুঝলো বাবা এসেছে.... বিছানা থেকে নেমে এদেক ওদিক তাকিয়ে খুঁজতে

লাগলো.....জানলার পাশে প্রজাপতির ছবি হাতে দাঁড়িয়ে রডরীখ স্যার.....তুমি কি আমার বাবা...রঞ্জন তাকে কোলে তুলে নিয়ে কপালে চুমো দিয়ে বললো,হ্যা সোনা,আমিই তোমার বাবা....এতদিন তুমি আমায় বলো নি কেন?....ভাবছিলাম দেখি আমার দুষ্টু প্রজাপতি তার বাবাকে চিনতে পারে কিনা.....আমি তো চিনত পেরেছি....তুমি আর আমাকে ফেলে বিদেশে যাবে না তো....না সোনা কক্ষোনো যাব না...দূরে দাড়িয়ে বাপ মেয়ের ভালবাসা দেখছিল মহুয়া ....আজ তার চোখে শ্রাবণের ধারা...এতদিনে তার আজ ভালবাসার বৃত্তটি পূর্ণ হল।

এন.এফ.এক্স. ১০

সোমা দাস

টাইম পিসটা বিপ বিপ করে উঠলো,অয়ন চোখটা মেলে দেখলো দেড়টা বাজে।বাথরুম থেকে মুখে চোখে জল দিয়ে এসে অয়ন পড়তে বসলো।আর ঠিক দু মাস বাদেই উচ্চ মাধ্যমিকে বসবে।পড়াশোনার জন্য সে এই তিনমাস তাদের তিন তলার ছাদের চিলেকোঠার ঘরটাকেই বেছে নিয়েছে।পড়তে পড়তে ছাদের হাওয়া খাওয়া যাবে।ছাদে পড়তে আসা নিয়ে বাড়িতে বাবা আর মায়ের সঙ্গে বেশ একপ্রস্থ হয়েগেছে।আসলে বাবা ভাবে অয়নকে তার মাই বেশী আস্কারা দিচ্ছে বলেই অয়ন এত ঘর থাকতে ছাদের ঘরে পড়তে গেছে।যাইহোক সে যাত্রায় ঠাকুমার হস্তক্ষেপে শেষ পর্যন্ত ছাদের ঘরেই বহাল থাকে।

ছাদের চিলেকোঠার ঘর টা হল অয়নের একটা পরীক্ষাগার।যেটা বাড়িতে ঠাকুমা ছাড়া আর কেউ জানে না।চারটে মাত্র প্রাণী থাকে এই বিশাল তিনতলা বাড়িতে।তাই অয়ন বাদে বাকিরা দোতলার ছাদ আর অতিথি এলে তিন তলার ঘর এই অবধি ঘোরাফেরা করে।একমাত্র অয়ন তার যাবতীয় খেলাধুলা সব ঐ ঘরেই

করে। আগে ঠাকুমার আমলে ভারী ট্রাঙ্ক থাকতো।সেগুলো তিনতলার ঘরে নামিয়ে রাখা হয়েছে।এখন শুধু একটা ছোট খাট আর যাবতীয় খেলার সরঞ্জামের সঙ্গে ভাঙা চিমটে কাঁচের শিশি বোতল,স্পিরিট ল্যম্প যেটা সে কিছুদিন আগে পেয়েছে এক দাদার কাছ থেকে এইসব আগড়ুম বাগড়ুম জিনিষে ভর্তি।

অয়ন বরাবর মেধাবী ছাত্র।বিজ্ঞানে প্রবল আগ্রহ।তার বাবা প্রচুর বই দিয়েছে কিনে।খেলনা গাড়ির ব্যাটারী আর ছোটখাটো যন্ত্রাংশ দিয়ে ইতিমধ্যে ছোট ছোট চাকা লাগান গাড়ি বানিয়ে দিয়েছে ঠাকুমাকে।যাতে পূজোর সময় ফুলের সাজি ফলের বাটি রেখে সুবিধা মত ঘুরিয়ে ফিরিয়ে রাখতে পারে।তার আবিষ্কৃত যাবতীয় জিনিষের মুল্যায়নকারী একমাত্র তার ঠাকুমা।ঠাকুমাকে আংটা লাগান ফোল্ডিং একটা হাতল দিয়েছে বানিয়ে উঁচু তাক থেকে জিনিষ নামানোর জন্য।তার এই উদ্ভাবনী শক্তি খুব ছোট থেকেই চলছে।ইউটিউব দেখে আরো কত কি যে বানাচ্ছে আর ভাঙছে তার হিসেব নেই।আসলে বিজ্ঞান মনস্ক অয়ন সারাক্ষণ ভাবে যদি একটা রোবট বানান যায় তবে মায়ের সাহায্যকারী গীতা পিসি না এলে সেই রোবট কে দিয়ে কাজ করানো যেত।

যাই হোক তার পরীক্ষা নিয়ে বিশেষ চাপ নেই। সিলেবাস মোটামুটি শেষ। এখন শুধু ঝালাই পর্ব চলছে। আসলে কোচিনে সারাবছর এত পরীক্ষা চলে বলে কোন ভাবনা নেই। ছাদের ঘরে তাই পড়ার পাশাপাশি অন্য কিছু করতে পারবে বলেই সে এই জায়গাটা বেছে নিয়েছে। এখন সে পড়ার সঙ্গে টাইম ট্রাভেলের ওপর একটা গল্পের বই পড়ছে। বইখানি তার মামা জন্মদিনে উপহার দিয়েছে।ভেবেছিল পরীক্ষার পর পড়বে।কিন্তু ঐ বইয়ের অমোঘ আকর্ষণ ছাড়তে পারেনি।তাই লুকিয়ে নিয়ে এসেছে।দোতলায় এসব তো করতে পারবে না।আসলে অয়ন ভাবে পড়ার পাশাপাশি এসব বই পড়ে সে তার মনকে ফ্রেস রাখতে পারে।সিলেবাসে একঘেয়েমীটাও লাগবে না।কিন্তু বড়োরা তো সেটা বোঝে না।অগত্যা তিনতলার ছাদের ঘরেই....

তবে পড়া নিয়ে সেরকম চাপ না থাকলেও,তার অন্য একটি চাপ রয়েছে।যবে থেকে সে এই নতুন গল্পের বইটি পড়া শুরু করেছে,তার সঙ্গে কি সব অদ্ভূত কান্ড ঘটে চলেছে।এখনো অবধি এই নিয়ে সে কাউকে বলে নি।লোকে তার কথা শুনলে স্রেফ পাগলের প্রলাপ বা অন্য কিছু বলে ঠাট্টা করতে পারে।যদি ও ঘটনাগুলি তার

নিজের কাছেও বোধগম্য নয়। ভাবছে এই গল্পের বই পড়ার ফলে স্বপ্নের ঘোরে তাকে সত্য মনে হচ্ছে।

তাই আজ সে মনে মনে ঠিক করে রেখেছে, এর একটা কিছু বিহিত তাকে করতেই হবে। সেইমত আজ ও তাড়াতাড়ি খেয়ে ছাদের ঘরে চলে এসেছে।ঘড়িতে রাত দেড়টার অ্যালার্ম দিয়ে শুয়ে পড়লো।যথাবিহিত বিপ আওয়াজে তার ঘুম ভেঙে যায়।আজ অয়ন খুব সতর্ক।তার পঞ্চ ইন্দ্রিয় অজানা কোন এক আশঙ্কায় টানটান হয়ে আছে।মুখের সামনে বইটি মেলে ধরে মনে মনে সেকেন্ডের হিসেব কষে চলেছে ।এই বুঝি কিছু হয়।কিন্তু পনের মিনিট হয়েগেলেও কিছু না ঘটায় .....খুব হতাশ হয়ে আবার পড়ায় মনোযোগ দেয়। মনে মনে শান্তি পেল এই ভেবে যে পুরো ব্যাপারটা তাহলে স্বপ্নই ছিল।

একটানা পড়তে পড়তে চোখে একটু ঝিমুনি লাগে।আর ঠিক সেই সময়ে তার মনে হল ঘরের সাদা টিউবটা কখন নীল হয়েগেছে।আবার সেই টেবিল লাগোয়া দেওয়ালটা কেমন জেলির মত থলথলে লাগছে। তার মধ্যে আলোর তরঙ্গ ভেসে বেড়াচ্ছে। উত্তেজনায় নিজের হার্টবিট সে শুনতে পাচ্ছে। চোখের কোণ দিয়ে দেখতে পেল পাশে

থাকা খাটটা উধাও, পায়ের তলার মেঝে নেই। সে শূণ্যে বসে আছে নাকি ভাসছে তা বুঝতে পারছে না।ভয় চোখ মেলে তাকাতে পারছে না।যদি আরো কিছু ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখে ফেলে। শরীরটা হঠাৎ যেন পালকের মত লাগলো......ভেসে যাচ্ছে শূণ্যে .....মহাশূণ্যে ভেসে চলেছেন......

অনু! অনু! ঠাকুমার ডাকে যখন চোখ মেলে তাকাল তখন পুবের আকাশে ভোরের রঙ লেগেছে।রোজ ভোরে তার ঠাকুমা ডেকে তোলে।তাকে মেঝেতে শুয়ে থাকতে দেখেই ঠাকুমা অমন চিৎকার করছিল।গতরাতের ঘটনটা মনে পড়তেই তাড়াতাড়ি দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে দেখলো পরিষ্কার দেওয়াল। মনে মনে ভাবলো এই ব্যাপারটা নিয়ে সে কারো সঙ্গে আলোচনা করবে। অনেক ভেবে সে বাবার বন্ধু নৃপেন কাকুর সঙ্গে আলোচনা করবে বলে ঠিক করলো।

অয়ন মনে মনে যা ভেবেছিল তার নৃপেন কাকুও তাকে সেই একই কথা বললো।স্বপ্ন তত্ত্বই বহাল রইল।অবশ্যি অয়ন গত রাতের ঘটনাটি পুরোটা ভেঙে বলেনি।পাছে তাকে পাগল ভাবে।সে যাই হোক মোদ্দা কথা এরকম

বিষয় যে কেউ স্বপ্ন বলেই ধরে নেবে।তাই তো সে মনে মনে বেজায় চিন্তিত।গল্পের বইটাকে আপাতত আলমারীতে তুলে রেখেছে।যত নষ্টের গোড়া তো এই বইটা। এরকম প্রতিরাতে পড়ার সময়ে স্বপ্ন দেখতে থাকলে সত্যিই যে পরীক্ষার রেজাল্টটা খারাপ হবে, এটুকু অয়ন বুঝতে পেরে গেছে।এখন সে ঠিক করে তিন তলার ছাদে আর পড়া নয়। দোতলায় নিজের পড়ার ঘরেই পড়বে। মাকে সেই কথাটা আগাম জানিয়ে রাখলো। কথাটা জানতে পেরে বাবাও খুশী হয়েছে।

আজ সোমবারে অয়নের কোচিন নেই। তাই স্কুল থেকে সোজা বাড়ি চলে এসেছে। কি জানি আজ অয়নের মনটা বেশ ফুরফুরে। গত রাতের ঘটনাটা স্রেফ স্বপ্ন বলে উড়িয়ে দিয়েছে সে। আজ রাতে দোতলায় পড়বে তাই যেন মনে একটু স্বস্তি লাগছে তার। যথাবিহিত রাতের খাওয়া তাড়াতাড়ি সেরে ফেলেছে, দেড়টার অ্যালার্ম বাবাই দিয়ে রাখলো। অয়ন শুতে চলে গেল।

রাত দেড়টায় অ্যালার্মের শব্দে অয়নের ঘুম ভেঙে যায়।টিউব জ্বালাতে যাবে সে সময়ে দেখে দরজার তলা দিয়ে হালকা নীল আলো চুঁইয়ে ঢুকছে।বিছানায় বসে গায়ে

চিমটি কেটে দেখে সে এটাস্বপ্ন না সত্যি।বেশ ব্যথা লাগে......তবে তো এটা স্বপ্ন নয় মনে মনে ভাবে অয়ন।এই মুহুর্তে তার কি করণীয় বুঝতে পারেনা।বিজ্ঞানের ছাত্র বলে এই ঘটনাকে ভৌতিক বলে মানতে নারাজ।তাই এর উৎস টা জানতে তার মনে প্রবল ইচ্ছা জাগলো।ধীরে ধীরে সমস্ত ঘরে মায়াবী নরম নীল আলোয় ভরে গেল।তারমানে ছাদে তাকে দেখতে না পেয়ে এখানে হানা দিয়েছে।যদি ও এখনো অবধি এই অজানা আলো থেকে তার কোন ক্ষতি হয় নি।তাই রহস্যের কিনারা করবার জন্য দরজা খুলে ছাদের দিকে এগোলো।রাতের বেলায় ছাদের ঘরের দরজাটা বাবা বন্ধ করে দিয়েছিল।কিন্তু এখন দেখছে খোলা।ভারী অবাক হল ,মনের কোণে সন্দেহ দানা বাধলো দরজাটা খুললো কে?

ছাদে উঠে দেখলো আকাশ ভর্তি তারা কোথাও নীলচে আলোর ছিটেফোঁটাও নেই।এক পা দু পা করে এবার ঘরটি দিকে এগিয়ে গেল অয়ন।এর দরজাটাও খোলা ভেতরে ঢুকে সে তাজ্জব বনে গেল! সে এটা কি দেখছে.....বিস্ফোরিত চোখে সে দেখলো ঘরের মধ্যে তার খাট বিছানা পড়ার টেবিল সব উধাও.....সারা ঘরে অদ্ভুত সব রঙের আলোর খেলা চলছে।গতরাতের দেওয়ালটা

যেমন ছিল সেই জেলির মত,আলোর তরঙ্গ ভেসে বেড়াচ্ছে।কোন ভুল দেখছে নাতো এই ভেবে গায়ে চিমটি কেটে ব্যথা পেল।মনের মধ্যে সন্দেহের একটা মেঘ দানা বাঁধছে তার।এটা কোন স্পেস শীপ টীপ নয়তো?মনের মধ্যে ভাবনা একবার উকি মারলো.....না না তা কি করে হবে......স্পেসশীপ কখনো ছাদে আসতে পারে ?..ব্যাপারটা হাস্যকর হয়ে যাচ্ছে।তবে কি ভৌতিক?সেটাই বা কেমন করে হয়।একবার সে ভাবল সত্যজিত রায়ের সিনেমা গুপিবাঘার মত ভূত নয়তো।সারাঘরে যে ভাবে আলো জ্বলছে।নাঃ মাথাটা তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে তার।আর সেই একভাবে আলোগুলো জ্বলছে নিভছে।

নিজের খাট টেবিলটাও তো দেখতে পাচ্ছে না।কতক্ষণ যে এভাবে কাটলো .....একসময় তার মেঝের দিকে নজর পড়তে পিলে চমকে গেল।আরে সে তার বাড়ির ছাদটা দেখতে পাচ্ছে.....ওপর থেকে দেখলে যেমনটি লাগে ঠিক তেমন টি।ঠাকুমার গামছা মেলা,ফুলের টব......একটু পরেই সেগুলো উধাও হল ।তারপর দেখতে পেল নীচের রাস্তা, আলোয় ভরা পথ ঘাট.....একসময় সেগুলোও কেমন বিলীন হয়েগেল।এবার মেঘ খালি মেঘ।সব মেঘই পায়ের নীচ দিয়ে সরে যাচ্ছে।পুরো অন্ধকার।এটা যে চলছে সে বোধটাই তো তার হত না যদি তার পায়ের দিকে নজর না

পড়তো।আশ্চর্য ব্যাপার এটা তবে চলছে কি করে।ঘরে সে ছাড়া আর কেউ নেই।তারমানে এটা মহাকাশ যান?যদি তাই হয়ে থাকে ....তবে এটা তার ছাদে এল কি করে আর কেনই বা এল?এমন অসম্ভব একটা ঘটনা ঘটছে ,অথচ কাউকে সে বলতে পারছে না।কেউ তার কথা বিশ্বাসই করবে না।এটা তার স্বপ্ন নয় মোটেও।

এখন তার ইতিকর্তব্য কি বুঝতে পারছে না।ধুর ভেবে লাভ নেই যা হবে দেখা যাবে এই ভেবে একটু বসতে ইচ্ছা হল,আর ঠিক তখনই দেখতে পেল এক কোণে উচু মত একটা বস্তু ।পদার্থ টা যে কি সেটা তার বোধের বাইরে।তাই আপাতত সে সবে মন না দিয়ে একটু আরাম করে বসলো।

বসে তার খটকা লাগলো যে এই জিনিষটা যাতে সে বসে আছে এতক্ষণ নজর এড়িয়ে গেল কি করে।কারণ তার বেশ মনে পড়ছে সে খুব ভালভাবে চার দিকটা জরিপ করেছিল।কি যে অদ্ভুত কান্ড ঘটে যাচ্ছে ভেবে কুল কিনারা পেল না।

একসময় ঘরের ছাদটাকে দেখতে পেল আবার।মনে যেন স্বস্তি পেল এই ভেবে যে এখান থেকে পালাতে পারলে বাঁচবে।ঘরের একটা দিক উজ্বল আলোয়

ভরেগেল......একরাশ কৌতুহল নিয়ে সে দিকে এগিয়ে সে যা দৃশ্য দেখলো তার জন্য মোটেও প্রস্তুত ছিল না।অয়ন দেখতে পেল তার বাড়ির ছাদে তারই মত দেখতে একটি ছেলে পায়চারি করে পড়ছে। তাকে দেখতে একেবারে ডুপ্লিকেট অয়ন!আরে ঐ তো ঠাকুমাও তার জন্য সকালের জলখাবার নিয়ে এসেছে।আসলে রোজ অয়নকে ছাদে ঠাকুমা জলখাবার দিতে আসে।আচ্ছা ঠাকুমা কি বুঝতে পারছে না যে ঐ ছেলেটি নকল।তবে কি আসল অয়ন মানে তার অনুপস্থিতে নকল অয়ন তার জায়গাটি দখল করে নিয়েছে?আঃ কি যে সব কান্ড ঘটে চলছে তার সঙ্গে ভেবেই মাথা ঘুরছে।ধুপ করে বসে পড়ে একটু ধাতস্থ হতে সময় নেয় অয়ন।

একবার ভাবে নকল ছেলেটার মুখোমুখি হয়ে একহাত নেবে।পরক্ষণেই মত বদলায় ,এতে বাড়ির লোকেরাও ঘাবড়ে যেতে পারে।ওকে যা কিছু করতে হবে আড়াল থেকে।তাই ঠিক করে ওই নকল অয়নেক আড়াল করে সে একবার দোতলায় যাবে মায়ের সঙ্গে কথা বলতে।যদি মায়ের কথায় কিছু আঁচ পাওয়া যায়।তাই পা টিপে টিপে ঐ নকল অয়নকে ছাদের ওপর মেলা ভেজা কাপড় গুলোর আড়াল থেকে দোতলায় নেমে আসে।মায়ের ঘরে যাবার

আগে তার ঘর পড়ে।একবার চট করে চোখ বোলাতে ঢোকে।ভাবে সেই নকল ছেলেটি তার আড়ালে কিছু জিনিষ সটকায় নি তো?

পড়ার টেবিলে তার সাধের পেন টা দেখতে পেয়ে চট করে পকেটে পুরে নেয়।খবরের কাগজটা রাখা ছিল।বাবার আগে সেই হেডলাইন গুলো পড়ে তারপর বাবাকে দেয়।হেডলাইন পড়তে গিয়ে দেখে সেটা রবিবারের পেপার।মনে মনে ভাবে রবিবারের পেপার এখানে কেন আসবে।সেটা তো ও নিজে হাতে স্টোর রুমে রেখে এসছে।রোজই রাখে আগের দিনের পেপার।গতকাল সোমবার ছিল।সেই পেপারটা তবে কোথায় গেল?আজ কে তো এই টেবিলে মঙ্গলবারের পেপার থাকবে।ধুত্তেরী !সবার মাথা গেছে নয়তো এ ছেলেটাই এইসব গন্ডগোল পাকাচ্ছে।নাঃ একটা কিছু করতে হবে।ভাবতে ভাবতে পাশের ঘরে মায়ের গলার আওয়াজ পায়,অয়ন ঘরে ঢুকতে ঢুকতে শুনতে পায় মা ফোনে বাবাকে বলছে,"তাড়াতাড়ি চলে এস মিষ্টি নিয়ে,জামাইবাবু দিদি বাড়ির কাছাকাছি চলে এসেছে" ।থমকে দাড়িয়ে পড়লো অয়ন......তারমানে?এইতো গতকাল মানে রবিবার মাসিমেসো কৃষ্ণনগর থেকে এসে ঘুরে গেল।আবার আজকেও......কই মা তো রাতে খাবার টেবিলে কিছু বললো

না।ঘরে ঢুকলো না অয়ন।দৌড়ে ঠাকুরঘরে গেল ঠাকুমার কাছে।দেখলো ঠাকুমার পূজো হয়েগেছে.....ঠাকুমাতো এত সকালে পূজো দেয় না রবিবার ছাড়া......আজকে কেন দিল.....সব কেন এমন উলটো পালটা হচ্ছে? ভেবে পেল না অয়ন। সে যে পথ দিয়ে এসেছিল সে পথ দিয়ে দৌড়ে ছাদের ঘরে ঢুকেগেল।দেখতে পেল নকল অয়ন সিঁড়ি দিয়ে নেমে যাচ্ছে।

ছেলেটির গমন পথের দিকে চেয়ে ভীষণ হতাশ লাগে তার।সে যেন নিজের বাড়িতেই রয়েছে ঠিক চোরের মতন।ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ে.....বসে পুরো ঘটনাগুলি মনে মনে সে সাজাতে থাকে।এই সময় একটা তীক্ষ্ম পিং শব্দে তার চেতনা ছিন্ন হয়।শব্দটা মনে হল তার ওই দেওয়াল থেকেই এল।অপেক্ষা করে সে আবার শোনার জন্য। আবার সেই তীক্ষ্ম পিং শব্দ। কিন্তু এবার অয়ন খেয়াল করে দেখলো শব্দযেন তার মাথার মধ্যে থেকে এল।পর পর শব্দ হতে লাগলো।দুকান চেপে রয়েছে.....শব্দটা যেন থামছেই না।মনে মনে বললো এবার তো থামো!ঠিক তখনই থেমে গেল।দেওয়ালে আলোর প্যাটার্ণ বদলে গেছে।তরঙ্গের বদলে বৃত্ত তৈরী হয়েছে।একটার পর একটা আলোর বৃত্ত ঘুরে চলেছে।বাইরের বৃত্তটা যদি ঘড়ির কাঁটার

দিকে ঘোরে ,পরেরটা উল্টো দিকে.....তারপরেরটা ও সে রকম .....একভাবে সে চাইতে পারছে না।অথচ কিরকম ভয়ঙ্কর একটা আকর্ষণ চলছে তার মনে সেটা দেখার জন্য।এক সময় সে চোখ মেলে তাকাল।

এবার সে শুনতে পেল একটা গলা।চারিদিকে তাকিয়ে কাউকে দেখতে পেল না।মনে হচ্ছে গলার স্বরটাও তার মাথার মধ্যে থেকে.......শুনতে পেল মানে অনুভব করলো কে যেন বলছে তাকে "ঘাবড়ে গেলে?"ফের শুনতে পেল .....ঘাবড়ে গেলে......ওর যেন বলতে ইচ্ছে করলো ;তাই বলে দিল হ্যা......ফের অনুভব করলো কেউ যেন বলছে....".ঘাবড়িও না,আমি তোমার বন্ধু"......
বন্ধু?তবে সামনে আসছো না কেন?
আমি তো তোমার ভেতরেই আছি।
আমার ভেতরে?তা কি করে হবে?
ঠাকুমা বলে আমাদের সবার ভেতরে ঈশ্বর আছে।তুমি কি ঈশ্বর?
না না আমি তোমার বন্ধু।আমি তোমাদের গ্রহ থেকে অনেক অনেক দূরে থাকি।আমার গ্রহের নাম NFX10 ।তোমাদের পৃথিবী থেকে কয়েক কোটি আলোকবর্ষ দূরে।

তা কি করে সম্ভব।অত দূরে তো এখনো আমরা পৌছাতেই পারিনি।তোমরা এলে কি করে?

এর উত্তর টা আমি দেব।তার আগে বল নতুন কি গল্পের বই পড়ছিলে?

হ্যাঁ একটা বই পড়ছিলাম টাইম ট্র্যাভেলের ওপর।মামা দিয়েছিল জন্মদিনে।

আমার উত্তর হল সেটাই।আমি ভবিষ্যতের গ্রহ থেকে সময়যানে চেপে অতীতের গ্রহ অর্থাৎ তোমার পৃথিবীতে এসেছি।অবশ্য এটাকে আমার ঠিক আসা বলা যায় না।কারণ আমি স্বশরীরে আসি নি।আমার একটা খেলনা যান পাঠিয়েছি যা আমি আমার গ্রহে বসে কন্ট্রোল করছি।ঠিক তোমরা যেমন রিমোটে টিভি চালাও,গাড়ীর আলো দরজা লক কর সেরকমই।

হ্যাঁ বুঝতে পেরেছি।আমরাও তো মহাকাশে স্যাটেলাইট পাঠাচ্ছি,মঙ্গলে ও মিস কিউরিওসিটি পাঠানো হয়েছে।বিভিন্ন দেশ থেকে মহাকাশের খবর সংগ্রহের জন্য মহাকাশ যান পাঠান হচ্ছে।যা এখান থেকে নিয়ন্ত্রণ হচ্ছে।

আহাঃ আমি সে কথা বলছি না।তোমরা কোথায় কি কি পাঠাচ্ছো তার সব খবর আমাদের আছে।তোমাদের মহাকাশ স্টেশনকে তো রোজই দেখি।আমরা সে সব অতীতেই করে এসেছি।আমরা যে টাইম ট্রাভেল করছি।তা এখনো তোমরা করে উঠতে পারো নি।তোমাদেরআইনস্টাইন তো অনেক আগে তাত্ত্বিকভাবে দেখিয়েছেন যে ,আলোর গতির সাপেক্ষে বস্তুর গতি বাড়িয়ে কিভাবে সময় কে নিয়ন্ত্রণ করে অতীত বা ভবিষ্যতে ভ্রমণ সম্ভব।কিন্তু তোমরা এখনো সেই তিমিরেই পড়ে আছ।তাই বলছিলাম তোমারা সময়যান এখনো বের করতে পারো নি।

হ্যাঁ ,তা হয়তো ঠিক।তবে আমরাও অদূর ভবিষ্যতে নিশ্চয়ই আবিষ্কার করতে পারবো।আচ্ছা বন্ধু তুমি আমাদের ভাষা জানলে কি ভাবে?

এটা কোন ব্যাপারই নয়।তোমার দেওয়ালে যে আলোর বৃত্তটা ঘুরছে,যারদিকে তুমি চোখ রাখতে বাধ্য হচ্ছো।আসলে সেটা আমি তোমাকে বাধ্য করছি।ঐ আলোর বৃত্তের মধ্যে দিয়ে তোমার মস্তিষ্কের নিউরোণে আমি

কতগুলো সঙ্কেত পাঠাচ্ছি।সেই সঙ্কেত তোমার মস্তিষ্কের যে অংশ কথা বলতে সাহায্য করে, সেখানে গিয়ে তা তোমার চিন্তা ভাষা এসবকে পড়ে নিয়ে,তোমার ভেতর থেকেই কথাটা বলিয়ে নিচ্ছে।তুমি নিশ্চয়ই সেটা বুঝতে পারছো যে শব্দগুলো তোমার মাথা থেকেই আসছে।তোমার সঙ্গে আমার তরঙ্গের মধ্যে সম্পর্ক তৈরী করে নিয়েছি।তাই তুমি মনে মনে যা ভাবছো আমি তাই তোমাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি।এই যেমন বসার জায়গাটা দিলাম।তারপর শব্দটা বন্ধ করে দিলাম।

কিন্তু এত দ্রুত সেটা কি করে করছো।তাও আবার কোটি কোটি মাইল দূরে বসে?

আসলে তোমাদের পৃথিবীতে সে সব আবিষ্কার হতে বহু যুগ লাগবে।আমরা আলোর থেকেও দ্রুতগতির যান বানিয়ে ফেলছি বহু আগে।এখন যে যান আমরা ব্যবহার করি তা তোমাদের ভাষায় মনের গতির সমান।মানে তুমি ভাবলেই জিনিষ হাজির।

বাঃ এত উন্নতি করেছো তোমরা প্রযুক্তিতে!আচ্ছা এসব শুনে আমার মনে কিছু প্রশ্ন এসেছে।তুমি আমার কাছে

এলে কেন?আর তুমি কি আমার সাথে এমন কিছু করেছো যার জন্য আমি ভিষণ মুষড়ে গেছি।

হ্যা বন্ধু ,তোমার সাথে একটা ছোট্ট মজা করেছি।আসলে তোমাকেও টাইম ট্রাভেল করিয়েছি।আসলে তুমি যাকে নকল অয়ন ভাবছো ,সে নকল নয় (হাসি)।সেটা তুমি নিজে।তুমি সোমবারে পড়তে বসে আমার আলোর সঙ্কেত ধরে ছাদে এসেছো।আমি তখন তোমাকে একদিন পেছনে রবিবারে নিয়ে যাই।যারজন্য তুমি ঘাবড়ে গেছে।দুঃখিত আমি,তোমাকে কষ্ট দেবার জন্য।এবার তোমার
প্রথম প্রশ্নের উত্তরটা দিই।আসলে আমার ঘুরতে ভাল লাগে।কিন্তু আমার নিজের কোথাও যাবার উপায় নেই।তাই রিমোট কন্ট্রোলে এই লিলিপুট যানকে সব জায়গায় পাঠাই।এটা একটা যান্ত্রিক ত্রুটির জন্য ভুল করে তোমার কাছে চলে এসেছে।অবশ্য ভুল টা হয়ে ভালোই হয়েছে কি বল?তোমার মত পৃথিবীর একটা নতুন বন্ধু পেলাম।

তা অবশ্য ঠিক।যেখানে এই পৃথিবী বাসী বিজ্ঞানীদের কল্পনাও পৌছতে পারেনি।সেই ভবিষ্যতের গ্রহের বন্ধুকে পেলাম।আচ্ছা তোমাকে কি নামে ডাকি বলতো?আর তুমি

কেন বললে যে তোমার নিজের কোথাও যাবার উপায় নেই?

ওরে বাবা একসাথে কত প্রশ্ন।আচ্ছা তুমি আমাকে NFX10 নামেই ডেকো।গ্রহের নামেই আমাদের পরিচয় হয়।আলাদা করে কিছু পরিচয় নেই।
আমার নিজের কোথাও যাবার উপায় নেই।কারণ আমরাও তোমাদের মত একটা সৌর পরিবারের সদস্য।তবে তোমাদের সূর্য থেকে আমাদের সূর্য বা সৌর পরিবারটা একদম আলাদা।আমাদের সূর্য কে ঘিরে মোট তিনটে গ্রহ ঘুরছে।আমরাই হলাম প্রথম গ্রহ।তোমাদের তো নবগ্রহ।তবে তো নয় নম্বরটা তো তিনটে বামন গ্রহ।আমাদের সূর্যের গড় তাপমাত্রা তোমাদের সূর্য থেকে দশগুণ।সেই সৌর পরিবারের প্রথম গ্রহ হলাম আমরা।তাহলে বুঝতেই পারছো আমাদের গ্রহের তাপমাত্রা কতটা বেশী।

সেকি তাহলে তো তোমাদের ঝলসান অবস্থা!তোমাদের গ্রহে কোন উদ্ভিদ আছে?চাষবাস তবে কি করে হয়? তোমরা তবে কি খাও?

ধীরে বন্ধু ধীরে।তোমাদের মত আমাদের খাবার খেতে হয় না।বলতে পার আমাদের খাদ্য হল একপ্রকার কণা যা সূর্যের থেকেই আমরা পেয়ে যাই।তোমাদের কাছে জল হল জীবন।আমাদের কাছে সর্বাধিক তাপমাত্রায় সেই কণাই হল জীবন।তাই এই গ্রহ ছেড়ে অন্য কোথাও চট করে আমরা যাই না।বেশীর ভাগটাই এভাবে ইচ্ছামত সময়যান পাঠিয়ে দিই।তোমাদের মত আমাদের শরীরের আকার নেই।তোমরা পৃথিবী বাসীরা আমাদের যে কিম্ভুত আকার বানিয়ে সিনেমা করছো,গল্প লিখছো।আসলে আমাদের কোন আকারই নেই ।আমরা কতগুলো বিন্দুর সমষ্টি।তা দিয়ে আমরা ইচ্ছামত আকার নিতে পারি।একমাত্র তোমাদের গ্রহের রক্ত মাংসের শরীর রয়েছে।সে কারণে তোমরা তোমাদের ঈশ্বর থেকে শুরু করে গ্রহান্তরের প্রাণীদের সে রূপ কল্পনা কর।ঈশ্বরকে সুন্দর বানাও,আর আমাদের কুৎসিত(হাসি)।তুমি বিশ্বাস কর তোমরাই কেবল মানবজাতি।এই অসীম মহাকাশে তোমাদের মত আর দুটি নেই।

যে জিনিষটা করতে তোমরা হাত পায়ের ব্যবহার কর তা আমরা বিন্দু দিয়েই নিয়ন্ত্রণ করি।দ্রুত গতির সময়যান পাঠিয়ে দিয়ে আমরা অতীত পৃথিবীর খবর রাখি।

প্রয়োজনীয় প্রযুক্তি দিয়ে সাহায্য করি তোমাদের।ঠিক যেভাবে তোমাদের সভ্যতার লগ্নে আমরা সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলাম।তা না হলে ঐ ভারী পাথরের পিরামিড বা আস্ত পাহাড় কেটে তোমাদের ইলোড়ায় মন্দির ছেনী হাতুড়ি দিয়ে করা সম্ভব ছিল।এখনো কি পৃথিবী বাসির কাছে সেই প্রযুক্তি এসেছে?

তাই সত্যিই তোমরা আমাদের সাহায্য করেছিলে?অবশ্যি এখন টিভিতে তোমাদের এই সাহায্যের বিষয় গুলি নিয়ে বেশ চর্চা হতে দেখছি।

তবে তোমরা যা করছো।বেশীদূর আর এগোতে পারবে না।ধ্বংস হলো বলে।এখোনো সময় আছে যদি তোমরা পারমানবিক অস্ত্রের বদলে মানুষের কল্যানের কথা ভাব ।তাহলে বেঁচে যেতে পার।

তা না হলে এই গ্রহে মানবজাতি বলে কিছু থাকবে না।তোমরা এ ব্যাপারে এগিয়ে এস।এই গ্রহ কে সবুজে ভরিয়ে দাও।যত বেশী গাছ তত বেশী তাপ শোষণ।প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় রাখ।গ্রহান্তরের খবর দিয়ে তোমাদের কি লাভ হবে?আগে নিজের গ্রহকে বাঁচাও।পরষ্পরের হানাহানি বন্ধ কর।গ্রহের সামগ্রিক

উন্নতি সাধনের আগুয়ান হও।তোমরাই এই গ্রহের উত্তরসুরী ।তোমাদের কেই হাল ধরতে হবে।

তোমার কথা মনে রাখবো বন্ধু।

আচ্ছা আমার বিদায় নেবার সময় হয়েছে।আমি তোমার ঘর টা ছেড়ে দিচ্ছি।খুব ভাল তুমি আর তোমার এই ছোট্ট ঘর।আমার গ্রহের তরফ থেকে বিদায় বেলায় একটা উপহার রেখে যাব।আমি চলে গেলে দেখতে পাবে।
তবে আমার এই পেনটা তুমি নিয়ে যাও।এটা আমার গ্রহের তরফ থেকে একটা উপহার।বিদায় বন্ধু।

পরের দিন সকালে ঘুম ভাঙলো ঠাকুমার চেঁচামেচীতে।বললো,তোর ঘরের দেওয়ালে ওরকম অদ্ভুত রঙের ফোঁটা কে দিল?অয়ন সেদিকে তাকিয়ে মিটিমিটি হাসতে লাগলো

সোমা দাস

শাস্তি

মিসেস গোমস

ইনি কে?

ভালোবাসা

এন.এফ.এক্স. ১০

৫টি ভিন্ন স্বাদের গল্প নিয়ে এক অনবদ্য সংকলন

Publisher: **ISBN:**